বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নোবেলজয়ী ক্রিসপার জীনোম এডিটিং প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্ভাবনা

ড. মোঃ রাসেল উজ্জামান

ক্রিসপার/কাস-৯ নামক জীনোম এডিটিং প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য রসায়নে এ বছর (2020) নোবেল পুরষ্কারের জন্য যৌথভাবে মনোনীত হয়েছেন ফরাসী বিজ্ঞানী ইমানুয়েল শার্পেন্টিয়ার ও মার্কিন বিজ্ঞানী জেনিফার ডোডনা। ক্রিসপার/কাস-৯ নামক জীনোম এডিটিং প্রযুক্তিটি ২০১২ সালে সর্বপ্রথম মানব কোষে প্রয়োগ করা হয় এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফল মৌলিক বিজ্ঞানের খুবই বনেদী সাময়িকী সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের পর থেকেই জীনোম এডিটিং এর এই নতুন প্রযুক্তিটি বিজ্ঞান গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে বিশেষত জীববিজ্ঞানের গবেষণায় এটি একটি অত্যবশকীয় প্রযুক্তি হয়ে দাড়িয়েছে। বর্তমানে এই প্রযুক্তিটি প্রাণি, উদ্ভিদ, এবং মানব কোষের গবেষণায় নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে। ফসল ও গবাদি পশুর উন্নত জাত উদ্ভাবনসহ মানুষের বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিটি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ক্রিসপার/কাস-৯ জীনোম এডিটিং প্রযুক্তি দ্বারা গবাদি পশুর উন্নত জাত তৈরি করাও অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।

উৎকৃষ্ট ফিমেল (মাদী) জেনেটিক্সকে অর্থাৎ অসাধারণ ভাল গুনের অধিকারী কোন মা প্রাণির বৈশিষ্ট্যকে দ্রুততম সময়ে প্রসারের ক্ষেত্রে উন্নত জীবপ্রযুক্তির কৌশল হিসেবে 'সারোগেসি' পন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায় কারণ স্বাভাবিক উপায়ে করতে গেলে, উদাহরণস্বরুপ একটি গাভী থেকে প্রতি বছর সাধারণত একটি বাচ্চা আশা করতে পারি। কিন্তু 'সারোগেসি' প্রক্রিয়া হরমোন প্রয়োগজনিত সুপার-ডিম্বস্ফোটন প্রোগ্রামের সাথে জড়িত, যার ফলে দাতা গাভী (উৎকৃষ্ট ফিমেল জেনেটিক্স) থেকে বেশ কয়েকটি ডিম নির্গত হয়। দাতা গাভীর ডিম্বানুগুলো প্রাকৃতিক অথবা আর্টিফিসিয়ালি (পরীক্ষাগারে) কোন নির্দিষ্ট ষাঁড়ের শুক্রানু দ্বারা নিষিক্ত করার পর অনুন্নত জেনেটিক্সের একাধিক গাভীর (সারোগেট) গর্ভে প্রতিপালন শেষে প্রসব করানো হয়। প্রসবকৃত প্রাণিগুলো ঐ নির্দিষ্ট ষাঁড় এবং দাতা গাভীর জিনগত বৈশিষ্ট্য ধারন করে। সম্প্রতি একদল বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানীর 'ক্রিসপার' প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে 'সারোগেট' ষাঁড় তৈরীর উচ্ছসিত দাবী নিঃসন্দেহে জীবপ্রযুক্তির এক অসাধারন অগ্রগতি।

ক্রিসপার প্রযুক্তির মাধ্যমে 'সারোগেট' ষাঁড় তৈরীর বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ। এ প্রক্রিয়ায় পুরুষের উর্বরতা (ফার্টিলিটি) নিয়ন্ত্রণকারী একটি জিনকে সম্পাদন করে প্রথমত একটি বন্ধ্যা ষাঁড় তৈরী করা হয় যেটি বীর্য (সিমেন) উৎপাদনে অক্ষম। তারপর পছন্দসই জেনেটিক উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট দাতা ষাঁড়ের বীর্য উৎপাদনকারী স্টেম সেল উক্ত বন্ধ্যা ষাঁড়ের অন্ডকোষের নির্দিষ্ট অংশে স্থানান্তর করা হয়। ফলশ্রুতিতে বন্ধ্যা ষাঁড়টি একই সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সচল হয় এবং দাতা ষাঁড়ের জিনগত গুনাবলীর বীর্য উৎপাদন করে।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এ প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রাণি গয়াল (বনগরু) সংরক্ষণে এই প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে আশীর্বাদ। এই শ্রেণীর গবাদি পশুর উর্বরতাজনিত সমস্যা বিদ্যমান। এদের টিকিয়ে রাখা এবং দ্রুত সময়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে ক্রিসপার প্রযুক্তির গয়াল ষাঁড় বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যদিকে আমাদের অল্প উৎপাদনশীল স্থানীয়/দেশজ প্রাণিসম্পদের প্রাণিগুলি নির্বাচিত নয় এবং প্রকারভেদে এগুলো না দুধের জন্য সমাদৃত না মাংসের জন্য। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংকর প্রজনন নীতিমালায় কেন্দ্রীয়ভাবে ভাল ষাঁড় উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত। মাঠপর্যায়ে এসব ষাঁড়ের ফলাফল প্রত্যক্ষ করার পর খামারীদের মাঝে কোন একটি বিশেষ পছন্দসই জেনেটিক উত্তরাধীকার ষাঁড়ের বীর্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়াটায় স্বাভাবিক।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে, একটি ষাঁড় থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা আয় করেছে সরকার। যার আইডি নম্বর এফআর-২৫। শাহিওয়াল জাতের গাভী ও ফ্রিজিয়ান ক্রস ব্রিড থেকে এই ষাঁড়ের জন্ম দেশে। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে ষাঁড়টি থেকে ৬ লাখ ২৩ হাজার ৩৬০ ডোজ সিমেন সংগ্রহ করা হয়। খামারিদের কাছে প্রতি ডোজ সিমেন ৩০ টাকা দরে বিক্রি করে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৮০০ টাকা আয় করে সরকার। সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার সূত্র জানায়, খামারিদের কাছে শাহিওয়াল-ফ্রিজিয়ান ক্রস ব্রিডের এই ষাঁড়ের সিমেনের চাহিদা ছিল বেশি। কারণ এই ষাঁড় থেকে উৎপাদন হওয়া গাভী থেকে ১৭ থেকে ২২ লিটার পর্যন্ত দুধ মিলেছে। ফলে খামারিদের কাছে এই ষাঁড়ের সিমেনের কদর ছিল বেশি।

আবহাওয়া ও জিনগত মিথষ্ক্রিয়া উৎপাদনকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। তাই পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী ষাঁড়ের প্রয়োজন ফুরাবার নয়। সুতরাং ক্রিসপার নি:সন্দেহে একটি খেলা-পরিবর্তন করার কৌশল হিসেবে বাংলাদেশের ডেইরী উন্নয়নে দারুন ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও এ প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্রুততম সময়ে উন্নয়ন করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, এর মাধ্যমে প্রাণিদেহে নতুন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঢুকানো হচ্ছেনা পক্ষান্তরে শুধুমাত্র জিনের প্রয়োজনীয় জ্ঞাত অংশ প্রতিস্থাপন করা হয় এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে এই প্রতিস্থাপিত অংশ প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন না কোন স্বাভাবিক প্রাণিপালে ইতোমধ্যেই বিদ্যমান। অর্থাৎ পরিবর্তিত বিষয়টি প্রাকৃতিক এবং ক্রিসপার প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা তা ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সুতরাং এখানে ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না, উপরন্তু আমরা দ্রুততম সময়ে প্রত্যাশিত ফলন আশা করতে পারি।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রিসপার জীনোম এডিটিং প্রযুক্তির অপার সম্ভাবনা থাকলেও, বাংলাদেশে এর ব্যবহার তেমনভাবে শুরু হয়নি। এ ধরনের অতি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যে প্রশিক্ষিত লোকবল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দরকার তা বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাই। তাছাড়া বাংলাদেশে সরকারী বা বেসরকারীভাবে গবেষণার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা দিয়ে এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা অসম্ভব। সুতরাং, ক্রিসপার/কাসের মতো অতি আধুনিক জীনোম এডিটিং প্রযুক্তি বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন গবেষণাগার, জীনোম এডিটিং বিষয়ে দক্ষ জনবল এবং গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ। তাহলেই এই আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে বাংলদেশের প্রাণিসম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন আনা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।